জোট সরকারের মিশন : আত্মঘাতী নির্বাচন কমিশন

অ নি রু দ্ধ আ হ মে দ

এক.

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে হুমকি আসতে পারে নানান মহল থেকে এই আশঙ্কা বাংলাদেশের ইতিহাসের মতোই একটি পুরোনো আশঙ্কা। ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় , বাংলাদেশের মানুষ তেমনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানান রকম ষড়যন্ত্র নিয়ে বরাবরই ভেবেছে। কখনও সে আশঙ্কা করেছে তৃতীয় কোন শক্তির হস্তক্ষেপের , কখনও সে দেখেছে মৌলবাদী এবং জঙ্গি ইসলামি শক্তির আস্ফালনে তৈরী হয়েছে গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি। বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে যে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে বাংলাদেশে , বোমা বিস্ফোরণে , সন্ত্রাসী হুমকিতে এর কোনটাই গণতন্ত্রের অনুকুল কোন বিষয় নয়। এর সব কিছুকে কেবল বাংলাদেশে নয় , সর্বত্রই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবশ্যাম্ভাবী হুমকি বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু এও কি বিশ্বাস করতে হবে এখন বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে যে এবারের হুমকিটি এসছে তাঁদের তরফ থেকে যাঁরা কেবল যে গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ তা-ই নয় , তাঁরা হচ্ছেন গণতন্ত্রকে সক্রিয় ও সচল করার সব চেয়ে প্রধান মাধ্যম। সে জন্যেই মনে হয় যে বাংলাাদেশের গণতন্ত্র এখন এক অভিনব হুমকির সম্মুখীন। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে এবারের হুমকিটি কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠির কাছ থেকে আসছে না , কোন মৌলবাদী দল ও প্রত্যক্ষ ভাবে কোন হুমকি দিচ্ছে না কারণ তারা গণতন্ত্রের আড়ালেই তাদের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণকে লুকিয়ে রাখছে সযত্নে। এই হুমকি আসছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেই।নির্বাচন কমিশন যে কখনও গণতন্ত্রের রীতি রেওয়াজ লংঘন করতে পারে এমন নিলর্জ্জ ভাবে সেটি কল্পনাতীত বিষয়। সত্যবটে যে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আগেও আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে বহুবার কিন্তু গুণগত ভাবে সেই সব আপত্তির ধরণটি ছিল ভিন্ন । নির্বাচন পরিচালনায় তাঁদের ব্যর্থতা নিয়ে অতীতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে , কখনও কখনও তাঁদের নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু এবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বহু আগেই নির্বাচন পরিচালনার সর্বো”চ পর্ষদ এই নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নৈরাজ্য, সংবিধান লংঘন করার যে প্রবণতা এবং আদালতের আদেশ মান্য না করার যে প্রচেষ্টা সে সব গণতন্ত্রকে কতখানি গণমুখী করতে পারবে , সে নিয়ে প্রচুর সংশয় রয়েছে। সেই সংশয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে , নতুন একটি আশঙ্কা । নির্বাচন কমিশনে আরো যে দু জন সদস্য নিয়োগ করা হলো , তাঁদের রাজনৈতিক প্রবণতা ও আনুগত্য নিয়ে যেমন প্রশ্ন আছে , তেমনি প্রশ্ন আছে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে। দু জন নতুন কমিশনারের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তিনি ক্ষমতাসীন বি এন পি দলের সমর্থক , অপরজন সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তাঁর বাড়িতেই বসবাস করেন বি এন পি’র সঙ্গে সংশিস্নষ্ট একজন অপরাধী যাঁর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই

মামলা রয়েছে। এই রকম পটভুমির অধিকারী ব্যক্তিরা গণতন্ত্রের সব চেয়ে স্পর্শকাতর সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর গুরুদায়িত্ব পালন করবেন সেটি কল্পনাতীত ব্যাপার । তবে এই মনোনয়নের কারণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে তাঁর মেরুবর্তী পক্ষপাতিত্বকে এক ধরণের বৈধতা দিতে পারবেন এবং নানান বাস্তব ও কাল্পনিক কারণে স্থগিত বৈঠক যে অচিরেই অনুষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেবেন সে বিষয়ে বোধ করি তেমন কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কৌশলগত লড়াইয়ে আপাতত বিজয়ী হলেন , পরাস্ত হলো গণতন্ত্র ।

দুই

বলাই বাহুল্য যে নির্বাচন কমিশন হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে। সেই দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশনের ভুমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ । পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গণতন্ত্রায়ন যে অর্থবহ হয়ে উঠেছে এবং এর সাফল্য যে আমাদের চমৎকৃত করে , তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে সেখানকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন । নির্বাচন কমিশনের ওপর সেখানকার ক্ষমতাসীন সরকার যে খুব খুশী থেকেছে তা নয় কিন্তু ভারতের নির্বাচন কমিশনগুলো সরকারী রোষের কোন তোয়াক্কা করেনি। তারা এই সত্যটা জেনেছে নির্দ্বিধায় যে ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাবিহিন দলকে সন্তুষ্ট করা তাদের কর্তব্য নয়। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণ যাতে তাদের ভোটাধিকার সুষ্ঠু ভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করা। এখনও স্মরণ করা যেতে পারে ভারতের সাবেক নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশনের স্বাধীন ও সাহসী ভুমিকার কথা। তৎকালীন ক্ষমতাসীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তটস্থ থেকেছেন সেশনের আশঙ্কায় । নির্বাচনকে সম্পুর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে টি এন সেশন সরকার ও বিরোধীদলের তীব্র সমালোচনার মুখেও যে বস্তুনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সে কথা এখনও অনেক ভারতীয় গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন। আর সে কারণেই নির্বাচন কমিশন কোন কোন মহলে কখনও কখনও সমালোচিত হলেও বিতর্কিত হয়নি। এমনকী পশ্চিম বঙ্গে আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেখানকার নির্বাচন কমিশনের যে প্রস্তুতি সেটি ও প্রশংসনীয় । নির্বাচন পুর্ববর্তী অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে সেখানে বিশেষ পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন । ভারতের নির্বাচনে ও কারচুপি হয় কিন্তু সেই কারচুপির দোষে নির্বাচন কমিশন দুষ্ট সে কথা বোধ করি বলা যাবে না। সত্য বটে যে গণতন্ত্রের একমাত্র সাফল্য তার নির্বাচনে নয় বরঞ্চ গণতন্ত্রকে সমাজ সঞ্জাত হতে হবে কিন্তু পাশাপশি এ কথা ও সত্যি যে গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি অত্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত পরিমাপ হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন । সেই নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক গুরু দায়িত্ব যে কমিশনের পালন করার কথা সেই কমিশনের ভুমিকা এবং তার সর্বো”চ পদাধিকারী ব্যক্তির ভুমিকাও যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় , তখন গণতন্ত্রের একেবারে মর্মমুলেই আঘাত

লাগে। সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাবজণিত যে অনাস্থা রয়েছে সে কারণেও।

তিন

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট উপধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। এই বিধানের অবশ্য অলিখিত পুর্বশর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রপতিকে ও নিরপেক্ষ হতে হবে , তা তিনি দলীয় মনোনয়নে নির্বাচিত হন না কেন । প্রকৃত সমস্যার সুচনা সেখান থেকেই । আমাদের দুর্ভাগ্য রাষ্ট্রপতিরা রাষ্ট্রপতি পদগ্রহণের পর ও দলীয় আনুগত্য বজায় রাখেন , খুব পরিষ্কার ভাবে। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী , ওমন যে কঠিন দলীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন , ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব যিনি গত নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অস্স্ন মধুর ভাষায় বিষোদ্গার করতে সব সৌজন্যকে সযত্নে পরিহার করেছিলেন , সেই ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিরপেক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করছিলেন , তখন তাঁর বহুদিনকার দল তাঁকে সেই পদ থেকে কার্যত টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলে। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রপতিরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন না । তাঁরা নিরপেক্ষ হতে চাইলেও ক্ষমতাসীন দল তাঁদেরকে নিরপেক্ষ হতে দেয় না। সুতরাং নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিরা যে স্বাধীন ভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না , সেটি সপ্রমাণিত। আসলে সংবিধান অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন আলোচনা বা তাঁর কোন সুপারিশ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। অথচ পত্রপত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী জানা গেছে যে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দিয়েছেন , প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সেই ভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। যে দেশে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে , নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিযুক্ত হয় সেই দেশে দলীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো দলীয় মনোনয়নে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি যখন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন তখন গোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটাই পরিহাসে পরিণত হয়। বাস্তব ও তিক্ত সত্যটা হচ্ছে যে অলিখিত ভাবে রাষ্ট্রপতিরা যে ভাবে দলীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হন , সেটি রাষ্ট্রপতির উ”চাসনকে অনেকটা খর্ব করে ফেলে। সত্যবটে সংসদীয় নির্বাচন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির অনেকগুলো ভুমিকাই আনুষ্ঠানিক এবং প্রথাসম্মত ভাবে তিনি মুলত একটি নির্বাচিত দলীয় সরকারের নীতির অনুকুলেই কথা বলেন যেমন বলেন বৃটেনের রানীও , বৃটিশ পার্লামেন্টে তাঁর বার্ষিক ভাষণে । সে বিষয়ে বোধ হয় বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাজের গন্ডি আনুষ্ঠানিকতার বাইরে খুবই সামান্য।

তবে নির্বাচন সংক্রান্ত্ম কাজে , নির্বাচন কমিশন গঠন থেকে শুরু করে , নির্বাচনের সময়ে সম্পুর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করা পর্যন্ত্ম , রাষ্ট্রপতিদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার একটা সুযোগ থাকে। দুর্ভাগ্যবশত , নির্বাচন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে রাষ্ট্রপতিরা দলীয় প্রভাবমুক্ত হতে পারেন না প্রায়শই এবং সেই কারণে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতো একটি সাংবিধানিক পদও রূপান্ত্মরিত হয় একটি সরকারী পদে। নির্বাচন সংক্রান্ত্ম গোলায় গলদের সুচনা বোধ করি এখান থেকেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েও রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়ে থাকেন , সেই দায়িত্বের অসদ্ব্যবহারের একটি সুযোগ তখন সৃষ্ট হয় দলের প্রতি অতি অনুগত কোন রাষ্ট্রপতির জন্যেও। সে জন্যেই সম্ভবত বিরোধীদল প্রতিরক্ষার বিষয়টিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে অর্পন করতে আগ্রহী যদিও চলমান পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের মনোনয়নের ও একটি পুর্নাঙ্গ সংস্কার চায় বিরোধীদলগুলো। সে নিয়ে সরকারের সঙ্গে একটি অর্থবহ সংলাপের প্রয়োজন রয়েছে , রয়েছে আইন সংস্কারেরও । তবে সেই প্রসঙ্গ এই নিবন্ধের বর্তমান আওতার বাইরে।

চার

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আদালতের আদেশ না পাওয়ার অজুহাতে যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন তাতে মনে হচ্ছে আইন মান্য করার ব্যাপারে এই সাবেক বিচারপতির অনীহা প্রায় অসামান্য ধরণের । ভোটার তালিকা নতুন করে প্রণয়ন করার যে একতরফা সিদ্ধান্ত্ম তিনি নিয়েছেন , সম্ভবত সরকারী প্রণোদনায় , সেই সুত্র ধরে বলা যায় যে এই নির্বাচন কমিশনারের কাছ থেকে জাতি যে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পাবে , সেই আশা প্রায় ক্ষীণ হয়ে আসছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল আজিজ , নির্বাচন কমিশনে তাঁর দুজন সহকর্মীর সঙ্গে সহমত পোষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে ন বার বার এবং কমিশনের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত্মের পরিবর্তে এখন আসছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একক সিদ্ধান্ত্ম , এ সব লক্ষণের কোনটাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্যে কোন ক্রমেই শুভ নয়। এমনিতে হয়ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কাজে সাহায্য করার জন্যে আরো দু জন নির্বাচন কমিশনার যোগ দেয়ায় কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। নির্বাচন কমিশনের আয়তন বৃদ্ধিতে অতি সন্নাসীতে গাজন নষ্ট জাতীয় কিছু হবে কীনা , সে আশংকা বাদ দিলেও একটা মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসবেই। যেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার , অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে নুন্যতম যোগাযোগ পর্যন্ত্ম রক্ষা করছেন না , দিচ্ছেন না সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা সেখানে আরো দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে চাওয়ার পেছনে দুটি স্পষ্ট কারণ থাকতে পারে , প্রথমত তিনি তাঁর মতোই সরকার অনুমোদিত দু জন সহযোগি পেয়ে , ক্ষমতাসীন দলের সেবায় এখন অবাধে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন , দ্বিতীয়ত এই নতুন সহকর্মীরা তাঁর বশংবদ হলে তিনি ফ্রি স্টাইলে

কাজ করতে পারবেন। তখন বলবেন যে নির্বাচন কমিশনের পাঁজ্জন সদস্যের মধ্যে তিন জন অভিন্ন মত পোষন করছেন সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই অপরিহার্য। অথচ এই দু দিন আগেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা শুনতে রাজী হননি । আদালতের রায় নিয়ে ও গড়িমসি চালিয়ে যাচেছন তিনি , সম্ভবত কালক্ষেপণের একটা ইচ্ছে কাজ করছে , কোন দল বা গোষ্ঠিকে অতিরিক্তি সুযোগ প্রদানের অভিপ্রায়ে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অসুস্থতা নিয়েও নানান রকম গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে । এ নিয়ে চলছে মুখরোচক জল্পনা কল্পনা। কেউ কেউ বলছেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অসুস্থতা যতটা শারিরীক , তার অনেক বেশী রাজনৈতিক। যদি দুষ্ট লোকের এই সব সমালোচনা মিথ্যে ও হয় তবু ও কি প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্দ্বিধায় দাবী করতে পারবেন , তাঁর বস্তু নিরপেক্ষতা ? আর যদি তাই-ই না পারেন তা হলে তাঁর প্রতি অতি আবশ্যিক বিশ্বাসযোগ্যতায় তিনি একটি বড় রকমের ফাটল ধরালেন । ব্যক্তি বিশেষ কেবল নয় , নির্বাচন কমিশন নামের প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি যেভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার অগ্নি পরীক্ষায় পরাজিত করলেন , সেটি বোধ হয় গণতন্ত্রের প্রতি এখনকার সব চেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

পাঁচ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ সকল নির্বাচন কমিশনারের পদগুলো সাংবিধানিক। তাঁদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সরকার আইন মানেন না বটে কিন্তু তাঁদের বরখাস্ত করার কোন অধিকারই সরকারের নেই যে পর্যন্তই না তাঁরা সংসদে অভিশংসিত হন। সে ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধীদল এই নির্বাচন কমিশনের বিতর্ককে কেন্দ্র করে অচিরেই যে আরেকটি অচলাবস্থার সম্মুখীন হবে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। অথচ এ কথা এখন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত সদস্যদের নিয়ে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না। ক্ষমতাসীন জোট নির্বাচনে জয়লাভের কৌশলে আরেকটি অত্যন্তই গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠানকে যে ভাবে বিভাজিত করলো , সেটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের প্রতি চ্যালেঞ্জের এক অভাবিত মাত্রা খুলে দিল। এই জটিলতা থেকে রাষ্ট্রকে তাঁরা মুক্ত করতে পারেন , স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে। ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যে অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ সেই বোধশক্তি এই বিচক্ষণ সদস্যদের নিশ্চয়ই আছে। তাঁদের বুঝতে হবে যে বিশ্বাসযোগ্যতা তাঁরা হারাচ্ছেন এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য নয় জনগণের ।

ছয়

বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রধান । বিতর্কিত অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা হয়ত টিকে থাকবেন , ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন না । তাই আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে যেমন , তেমনি এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের জন্যে

যদি বিতর্কিত সদস্যরা পদত্যাগ করেন , তা হলে তাঁরা দেশের মঙ্গল সাধন করবেন। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সকল দলের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন কমিশনের নতুন সদস্য ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারেন। আসলে নির্বাচন কমিশন নিয়ে এই বিতর্ক এখন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করিয়েছে সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে যাঁদেরকে অতি আবশ্যিক ভাবেই বস্তু নিরপেক্ষ হতে হবে , রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকুলে। জোট সরকারের মিশনে যেন নির্বাচন কমিশন আত্মঘাতী না হয় , সে দিকে নজর দেওয়ার সময় এসছে সুশীল সমাজের , রাষ্ট্রপতির এবং নিবাুচন কমিশনের বিদগ্ধ ও বিতর্কিত সদস্যদেরও ।

[এই নিবন্ধ ভোরের কাগজে , ২০শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত]